আটের দশক: মেধাকেন্দ্রিক ভাষাসচেতন কবি অলোক বিশ্বাস

ড. ঋদ্ধি পান, গবেষক

সারাংশ:

নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক আদর্শ না থাকার দরুণ আটের দশকের কবিরা ব্যক্তিগত পরিসরে একইসময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বর নির্মাণ করেছিলেন কবিতায়। একইসঙ্গে পূর্ববর্তী উত্তাল সময়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাওয়া তাকে ক্রমাগত আত্মমুখী করেছিল। এই আত্মমুখীনতা কোনো সমাজ বিচ্ছিন্নতা নয়, কোনো আন্দোলন নয়। বাংলা কবিতার একটি বিস্তৃত পরিসর ব্যক্তিগত ভাবনায় চলে আসে। তাই আটের দশকের কবিতা অতীত এবং ভবিষ্যতের কবিতার সংযোগ স্থাপন করেছে। ভাষা প্রকরণ, বিষয় প্রকরণের বৈচিত্রময়তা কবিতাকে নতুন করে ভাবিয়েছিল। অলোক বিশ্বাসের মতো একজন কবি আটের দশকে তাঁর কবিতায় এই মেধানির্মাণের কাব্যভাষার কাজটি খুব সুদৃঢ় করে তৈরি করেছিলেন। বিষয়ান্তর, অপর ভাষা, প্রথাবিরুদ্ধ কথন হয়ে উঠেছিল কবিতার ভাষা।

মূল প্রবন্ধ:

ষাটের দশকের কবি অনন্ত দাশ তাঁর ‘আশির কবিতা: ভাষাবদলের কবিতা’য় বলেছেন – “আশির কবিতায় রীতি ও ভাষাবদলের স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ার মত। আশির স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত এই কবিরা মূলত ‘কবিতা ক্যাম্পাস’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন। শব্দের সচেতন ব্যবহার, নতুন শব্দ ও শব্দজোড় সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতার অবসান ঘটিয়ে একটি পর্বান্তর সৃষ্টি করেছেন।”[১]

অলোক বিশ্বাস আটের দশকের একজন উল্লেখযোগ্য কবি যিনি ‘মেধাকেন্দ্রিক ভাষাসচেতন’[২] ছিলেন। তা পাঠকের কাছে প্রথমে অন্যভাবে উপস্থাপিত হলেও ভাষার নতুন এক গূঢ়তর ব্যঞ্জনা এই কবির লেখাতেই রয়েছে। পাঠকের কাছে নতুন এই ভাষার বিস্তার ক্রমাগত কাছের হয়ে উঠেছে বলেই মনে হয়। প্রতি দশকে প্রতিষ্ঠান ভাষা তৈরি করে দিতে চেয়েছে। তাকে কখনো আপোষ, কখনো অল্প ভাঙার মধ্যে দিয়ে বিরোধিতা করা হয়েছে কিন্তু ভাষা তৈরি করে নিতে হবে – এই বোধ, এই নির্মাণকে জোরদার করে ফেলছিলেন আট দশকের প্রত্যেক কবিই। নিজেদের পৃথক স্বরেই। একে আমরা জোরপূর্বক প্রতিষ্ঠান ভাঙা বলতে পারি না। বলতে পারি একটি উদ্যোগ।

আটের দশক কবিতার নতুন শব্দের অনুসন্ধান করতে চেয়েছিল। তাদের সময়ের রাজনৈতিক মতাদর্শের অভাবে সমাজ জীবনের যে শূন্যতা নেমে এসেছিল, যে আস্থাহীনতা, কবিকে ঘিরে রেখেছিল তাকে রূপ দিতে হলে পুরোনো ভাষার ব্যবহারকে অযৌক্তিক মনে করেছিলেন কবিরা। যদি আশাহীনতার এই বিষয়টি রবীন্দ্র পরবর্তী কবিতায় ক্রমশ প্রকাশ্য হতে শুরু করে তাহলে তার পরিপূর্ণতার রূপমন্ডলী আটের দশকের কবি অলোক বিশ্বাস, ধীমান চক্রবর্তী, জহর সেন মজুমদার, প্রণব পালের কাব্যভাষার হাত ধরেই বিকশিত হয়। এই নিরাশ্রয়টি প্রতিষ্ঠানের ভাঙন চাইনি ঠিকই কিন্তু অস্বীকার করেছিল এটা বলতেই হয়। পণ্য আধুনিকতা বস্তুকেন্দ্রিক পশ্চিমী সংস্কৃতি তাদের কবিতার ভাষাকে প্রভাবিতও করে। তাদের সময় তাদের লেখার ভাষাকে তৈরি করেছে। এই ভাষা বদলের উদ্যোগ অন্য একটি প্রতিষ্ঠান, অন্য একটি ভাষা তৈরি করতে অনুপ্রাণিত করে যা কোনো আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ঘটেনি। 'শূন্যপ্রবাহের মুক্তাঞ্চলে'র ভাষাই আশির দশকের কবিতার ভাষা হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠানের ভার সেখানে নেই আবার অপ্রতিষ্ঠানের আন্দোলনও নেই। আছে একটি নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ।

আট এর দশকের কবিরা তার কবিতায় শব্দকে প্রতিষ্ঠা করল – এই বিষয়টিকে যদি খুঁটিয়ে জানতে চাই তাহলে অলোকের প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থ যার রচনাকাল আটের দশকেই তাকে ভালোভাবে লক্ষ করতে হবে। এই প্রথম কাব্যদ্বয় – 'নীল আয়না' এবং 'মাকড়সার জাল'। অলোক বিশ্বাস তাঁর সময়ের একজন যিনি একটি অসম্ভব পৃথক স্বর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর লিখতে আসার সময়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীল আয়না'ই তার প্রমাণ। আগে এটি 'নীল আয়নায় লাল ঘোড়া' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। 'নীল আয়না' পুরো পাঠ করলে মনে হয় এতদিন এভাবে কবিতাকে ভাবা হচ্ছিল না। প্রাথমিকভাবে পড়লে মনে হয় শব্দের পর শব্দ সাজানো এক ফ্যাণ্টাসির জগৎ কিন্তু এ হচ্ছে প্রেমেন্দ্র মিত্র'র গল্পের মতো যাকে প্রথমে দেখল তরল ভিতরে ভিতরে শিকড় সুগভীর বিস্তৃত। সচেতনভাবে প্রত্যেক শব্দের প্রয়োগে কবিতার ভাবগভীরতা এতটুকু নষ্ট হয়নি। এই কাব্যগ্রন্থের 'পাগলা' কবিতাটিতে দেখি "হৃদয়েরও আছে কিছু অন্যতর মেঘ, বৃষ্টি পড়ুক, টের পাবে। হৃদয়ের স্বরধ্বনি ছাড়া/ বাইরের ব্যঞ্জনধ্বনিটি একেবারেই অসহায়। বৃষ্টি পড়ার পর মনে হতে পারে, বৃষ্টি/ পড়লো কোথায়। হয়তো বিড়াল এসেছিলো, বৃষ্টিদের খেয়ে চলে গেছে।"[৩]

একটি প্রেমের কবিতাকে কীভাবে প্রকাশ করেছেন কবি, অবাক হতে হয়। কবির কথায়, – বৃষ্টির ভাষাই অক্ষম যদি তুমি শ্রাবণ পেতে বৃষ্টির তলায় না বসেছো। এই যে শ্রাবণ পেতে বসা

অথবা হৃদয়ের পুড়ে যাওয়া, বৃষ্টিতে পুড়ে যাওয়ার যে অসম্ভাব্য ভাব, এবং শব্দরূপ কবিতাটিকে একটি আলাদা মাত্রা দিয়ে দেয়। কখনোই মনে হয় না এটি কোনো বৈষ্ণব কবির প্রেমের কবিতা নয়। 'পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা', এই পিয়া হয়তো অলোক বিশ্বাসের কবিতায় নেই কিন্তু আছে 'বৃষ্টি' হয়ে। জড়ের জীব হওয়া যেমন আছে তেমন তার স্বকীয়তাটুকুও রয়েছে এই দুয়ের অস্তিত্বকে খুব সুন্দর করে ধরে রেখেছেন কবি। কাব্যগ্রন্থ জুড়ে অন্ধকারের কথা, শব্দের কথা, বিশ্বাসের কথা যেমন রয়েছে; রয়েছে অভিমানের সুর। আছে প্রাত্যহিকতার কচকচানি একইসঙ্গে শিমুলের ছায়াও। "কবিদের চিঠি যত্ন করে রেখে দিই কাঁচের বয়ামে। চিঠির ভেতরের কোনো বাক্য কোনো অনুভূতি কয়েকটা কবিতা লিখিয়ে নিতে পারে কোনোদিন। চলমান দুঃখ আর ভোরের কষ্ট কিংবা ঠকে যাওয়া উপেক্ষা, কবিতার ছলাৎছল হয়ে যেতে পারে।"[৪] বা "ভোর পাঁচটায়/ ঘুম থেকে উঠে ভাবি, আজ কিছু রঙিন কবিতা লেখা হবে। কবিতা এ্যাতোই সহজ/ যে, অনেকে নিজের সঙ্গে মারামারি কোরে অযথা শব্দকেই আক্রমণ করে"।[৫] আবার রোমাণ্টিকের বিষাদময়তা নেই আছে সেই সামঞ্জস্যভাব। কিন্তু তার সময়কে সে অস্বীকার করেনি তাই শূন্যতার বোধ নিয়েই সে লিখে চলেছে – "কেউই একা পোড়ে না। মানুষ যখন পোড়ে তখন হাতপাখা পোড়ে,/ শীতলপাটি, মাটির কলস পুড়ে যায়। পলাবাঁধানো নোয়া পুড়ে যায়। পুড়ছে, তবু মিথ্যা/ কথা বলে যে, সে পুড়ছে না। অন্যেরা যে দেখতেই চাই, দেখতেই ভালোবাসে,/ তুমিও তীব্র পুড়ে যাচ্ছো।"[৬]

'শ্রম' কবিতায় ভয়ঙ্কর একটি অসম্ভব শূন্যতার কথা বলে। "পিঁপড়েরা কিছু বলে না, দাগ এঁকে এঁকে পাহাড় আর ধূসর মরুভূমি পেরিয়ে/ পেরিয়ে ছিটকিনি খুলে দেয় দরজার আর জানলার। আমি অজস্র বলি,/ ক্যালেন্ডারের ঘষা পাতা ছিঁড়ি, হাত তুলতে জামা ছিঁড়ে যায়, পায়ে লাগে/ .../ পিঁপড়ের ঘনিষ্ট হতে চাই,/ ওরা কিছু বলে না। পাহাড় আর মরুভূমি পেরিয়ে সারি সারি মশাল, দরজা/ পেরিয়ে শীতকালীন ঘুম ফেলে রেখে এগিয়ে যায়"[৭] 'বিমানের গল্প' কবিতায় দেখি – "ডাক্তারবাবুরা তোমাকে ওষুধ খাওয়ানোর জন্য এরোপ্লেনের গল্প শোনাতো।" ঠাকুমা গল্প শুনিয়ে তোমাকে এ্যাতো বড় করেছে। আজো তুমি দ্যাখো রাতের আকাশে এরোপ্লেনরা কোটি কোটি রূপকথা লিখেছে। রূপকথারা তৈরি হয় আকাশের এরোপ্লেন দিয়ে। খোলা আকাশ নেই যন্ত্রে জীবন ভরে গেছে, সেই কঠিন সত্যকে এত সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় কবি প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে চুরমার করে দিতে চান না। তাই বাস্তবকে অস্বীকার করেন না। একটি সমঝোতা চান। তাই কতকগুলি শব্দ 'ভালোবাসা', 'বাগানবাড়ি', 'এ্যাতো', 'থোকা থোকা পারিজাত', 'টলতে

টলতে' এই শব্দগুলি বাদ দেন না। 'নীল আয়না' নামটিতে ব্যাথা লুকিয়ে আছে; সেই ব্যাথা কোনো প্রেমের নয়, জীবনের বেঁচে থাকার প্রতিক্ষেত্রের দুঃখ। যেখানে বিগলিত হয়ে নেই কিছু। কোনো নির্দিষ্ট বোধ যা কবিতায় দীর্ঘদিন লালিতপালিত সেটি ভেঙে দিয়েছেন কবি, যেমন – দুঃখের কবিতা ও ভালোবাসার কবিতা তাঁর কাছে এক। কবিতার শিরোনামে 'একটি দুঃখ কিংবা ভালোবাসার কবিতা'। একটি প্রতিমার বর্ণনায় পারুর চোখের মাদকতা মেশিন যে সাবাড় করে দেয় সেই কথাই প্রকাশ করেন কবি। দুইই তিনি রাখতে চান কিন্তু আশঙ্কা করেন নষ্টের। শব্দের প্রয়োগ সচেতন কোথাও গিয়ে, তাই 'বন্ধুত্ব' কবিতায় দেখি – "এরপরেও পাওয়া যাচ্ছে আরও মানুষের হাড়। হাড় দিয়ে দরজা হয়, সেতু হয়, সিঁড়ি/ হয়, মন্ত্রতন্ত্র হয়। মাঝেমধ্যে হাড়েহাড়ে শিখেছি হাড় চুবিয়ে নোটন নোটন পায়রাও/ হয় ভালো, শান্তির স্বপক্ষে ওড়ানোর জন্য। বিশ্বের আসরে তাতে হৃষ্টপুষ্ট হবে আসন।/ খামোকা পিছিয়ে থাকা, কে আর প্রত্যাশা করে। চাই বড়ো ফাইলের বহুমুখি উজ্জ্বল/ দর্শন, বিশ্বশান্তির জন্য"[৮]

শব্দের নতুন প্রয়োগ ঘটাতেই হবে, এই জায়গাতেই কবি প্রতিষ্ঠানকে ভেঙেছেন। শব্দের প্রয়োগে তিনি অনন্য কিন্তু কোথাও গিয়ে কবিত্বের শক্তি নষ্ট হয় না। তাই প্রথম কব্যগ্রন্থের তিনটি কবিতা 'শব্দ ১', 'শব্দ ২', 'শব্দ ৩', "দূরের মানচিত্র খুঁজতে গিয়ে তোমরা একই ভাষা বংশানুক্রমিকভাবে ব্যবহার কোরে/ এসেছো। তাদেরই নানা মাপে কেটেছেঁটে ঝালাই দিয়ে ঝারপোছ মেরে ঝালরের/ মতো দুলিয়ে দিয়েছো মানুষের আবেগের মেধায়। তোমাদের লাল সাম্যের গান/ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হ্যা হ্যা কোরে উঠেছে। তথাপি পরাজয় মেনে নেবো না/ পেছনের অভিধানে হেঁটে। অদ্ভুত শব্দগুলো আমারই হাতে আছে, যার বিমূর্তির কথা/ তোমরা শুনেছ।"[৯] অথবা "কেউ কেউ তোমাদের/ শব্দের সম্রাট করে তুলছে। তোমরা হ্যা-হ্যা কোরে পুনরাবৃত্তি কোরছো বালিময়/ অজস্র শব্দ। এরকমটা আমি দেখতে চাই না"।[১০] কোথাও গিয়ে কবিতাগুলিই আট দশকের একক কবির ইস্তেহার বা ঘোষণা। নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন কবি, তার জেগে ওঠবার আশা কেবল নিজে বদলের মধ্যে দিয়েই। কবির কাছে বোধের ভাঙন খুব স্পষ্ট – "কখনো পারুকে/ বিন্যাসহীন মনে হয়। ভেঙে যাওয়া প্রেরণা ও উপমাহীন মুখমন্ডল, আমার চেতনায়/ পারু বহুরূপে বিনির্মিত। অস্থির করে বহুরূপে, স্থির করে বহুরূপে"।[১১] ওনার পরিবর্তন, ঘোষণা করে হয়তো হয় না কিন্তু প্রতিটা কবিতাতে 'রিনিউয়াল', 'বদলানো', 'বহুনির্মাণ'-এর কথা নানাভাবে উল্লেখ রয়েছে। কবি যে

কখন নিজেই গড়ে তোলেন নিজের অজান্তে একটি প্রতিষ্ঠান উনি নিজেও জানেন না এইটাই তার প্রমাণ।

কৌরবের একটি সংখ্যায় অলোক বিশ্বাস নিজের কবিতা সম্পর্কিত অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন – "যে শরীরে প্রতিমুহূর্তে ধুলোমাটি পাথর লাগছে তার ত্বক বড়ই কঠিন। তাকে মোলায়েম বা সুড়সুড়িধর্মী করা যায় না বলেই বাংলা কবিতা এখনো টানটান। একে পাতি খিস্তাখিস্তি করে দমন করবে এমন কেউ পয়দা হয়নি এদেশে।"[১২] তিনি এও লিখেছেন অতীত অস্বীকার করে নয় অতীতের সাফল্য, অসাফল্যকে অতিক্রম করে নতুন কিছুর প্রকাশকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন। "আর তা হোলো নতুন মেথডে, নতুন টেকনিকে ইমেজ ও ভাষার প্রকাশ। এই মেথড বা টেকনিক ব্যবহার হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। প্রতি মুহূর্তে তা স্বভাবিকত্ব ও স্বতস্ফূর্ততা দাবী করে। এক্ষেত্রে মাপনী, ছুরি, কাঁচি বা রাসায়নিক পরীক্ষা নিরীক্ষা বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। যে কোনো বিষয়ই এখন কবিতার উপাদান হয়ে উঠতে পারে যদি তা ভাষায় প্রকাশের নতুন টেকনিকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। তবে একই টেকনিক সার্বজনীন হলেই বিপদ। বৈষ্ণব পদাবলীর কবিরা প্রায় একই টেকনিকে লিখে গেছেন।"[১৩] তাঁর এই নির্দিষ্ট বিষয়হীনতার ভাবনা থেকেই তিনি লিখেছেন – 'মাকড়সার জাল'-এর মতো কাব্যগ্রন্থ। কাব্যগ্রন্থটিতে 'মাকড়সার জাল' কবিতাটি দেখলেই বোঝা যায় শব্দকে নিয়ে যা পূর্ববর্তী কাব্যে হয়েছিল বিষয়হীনতার কথা তেমন কোনো ঘোষণা পূর্বক নেই। কবিতাটির প্রথম লাইন – "যেকোনো বিষয় যেমন মাকড়সার জাল নিয়ে গান লেখা যেতে পারে। মাকড়সার/ জাল আর ব্যক্তিগত বিষয় নয়, সামাজিক সম্পদ। এর প্রিয় বস্তু গাছ। গাছ মানে/ পাখির জগৎ, গাছ মানে জল। গাছ মানে মানুষের ভাবনা, গাছের হাওয়া আমাদের/ ভাষা। মাকড়সার জাল ব্যক্তিগত বিষয় হলে ভালোবাসা এ্যাতো প্রগাঢ় হতো না।"[১৪] এখানে উনি 'গান' শব্দের উল্লেখ করে একটি আড়াল চেয়েছেন অথবা উনি শিল্পের সব মাধ্যমের কথাই বলতে চান। ব্যক্তিগত ভাবনা বা অ-পর যা, পর নয় নিজস্ব জগতের মধ্যে সেই কাব্যভাবনার ঘোরাঘুরিতে কবি বিশ্বাসী নন। তাই কবিতায় অন্যবিষয়, আবহমানতাকে ধারণাকে ধাক্কা দিয়ে কবিতা লিখেছেন। 'ধোঁয়া কথা', 'মাকড়সার জাল', 'অ্যাশট্রে', 'পাপোষ', 'চাকা', 'বর্শা', 'নির্মাণ', 'মালা' এইসব নামে নতুন নতুন বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন। ধোঁয়ার আর মশারির বিবরণ দেখে বুঝি কবি বিষয়ান্তরে যান যাতে কবিতার স্বতস্ফুর্ততা নষ্ট হয়নি। কতগুলো নতুন কথা লিখতে গেলে নানা বিষয়ের যে দরকার পড়ে কবিতাগুলো পড়লেই বোঝা যাবে। যেমন – "শরীরে ধোঁয়ার আবরণ দেখে ভালোবাসার কথা বলি অথবা ঘৃণার কথা বলি।/

চোখভাঙ্গা ধোঁয়াকে শ্রদ্ধা জানাইওথবা অপমান ছুঁড়ে মারি। শীতকালে প্রিয়জনদের নাক মুখ থেকে যে ধোঁয়ার কুন্ডলী ওড়ে তাতো বেশ আশ্চর্য লাগে।"[১৫] আবার "আমি মশারির ভেতর থেকে সকলকে দেখে হাসি, বিশেষ কোরে মশাদের দেখে মুখ/ ভ্যাংচাই। মূল্যবান মশারি পৃথিবীর সমস্তরকম উত্থান-পতনের আবহাওয়া থেকে/ নিরাপত্তা দিয়েছে স্থিরতা দিয়েছে/ আমি মশারির ভেতর থেকে মোরগের নাচ ঘোড়ার নাচ মাকড়সার নাচ মশার নাচ/ এমনকি মানুষের নাচ দেখি, যারা যারা নাচতে পারে সকলকে অধিকার দিলুম মশারির/ কাছে এসে নাচতে কুদতে"[১৬]। কিংবা "তবে হ্যাঁ, আমার মশারির নিচে কাউকে শুতে/ দেবো না। মশারির ভেতর জোর কোরে কেউ ঢুকে পড়লে তাকে দু'হাতের তালুর মাঝখানে একবার রগড়ে দেবো"[১৭]। নিজের ক্ষোভ, আত্মঅনুভূতিকে মশারিকে কেন্দ্র করে প্রকশিত করেছেন। "এমন তো/ অনেকেই এসেছে কাবাসাকি দু'চাকা চারচাকা ঝমঝম ঝুমিঝুমি আর সাপদোলা বাঁশি।/ কেউ আমার ক্যালেন্ডারের ভালোবাঁশির ডেটগুলো তুবড়িয়ে রেখে গেছে। আমাদের/ কর্মশালায় যে চাকাই বলুক শেকলহীন দৌড়ের গান, হোক না নীলনয়না বা/ শস্যশ্যামল, চাকাদের খুঁটে খুঁটে দেখি, ভেঙ্গে ভেঙ্গে, পায়ে পায়ে গ্রহণের আগে"।[১৮] একটি চাকাকে কতরকম করে কবিতায় এনেছেন। পাপোশকে কতরকমভাবে প্রকাশ করেছেন – "তুই আমায় ক্ষমা কোরে দে পাপোশ। যদি ইচ্ছা করে আমার শরীরের পরাগরেণু খা।/ আবেগ খা। চোখের জল খা। পারিস তো ইয়াকের মতো হত্যা কর আমাকে। কিম্বা/ সমগ্রকে ধুলো কোরে গুঁড়িয়ে ঢকঢক খেয়ে নে। এর চেয়ে বেশি সাধ্য নেই। ক্ষমা কোরে দে পাপোশ, আয়, এগিয়ে আয় আমার দিকে"[১৯]। কোনো তত্ত্ব ব দর্শন এই কবির কবিতায় নেই। অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর 'কবিতা ২' প্রবন্ধে লিখেছেন "আশির দশকের তরুণ কবি আজ নিজের পারিপার্শ্বে বড়ো মাপের কোনো আদর্শ দেখতে পান না। প্রশাসনের সর্বস্তরেই ব্যর্থতার ছাপ। রাজনীতি যে আদর্শের কথা বলে সে আদর্শ অনুযায়ী চলে না। দেশের প্রকৃত অধিকার শিল্পপতিদের হাতে। প্রতিদিন কমে যাচ্ছে একজন বেকারের কর্মসংস্থান সম্ভাবনা, প্রতিদিনই বেড়ে যাচ্ছে জিনিসের দাম"[২০]। রাজনীতি বা দর্শন – যেকোনো তত্ত্বভাবনা না থাকার দরুন আট দশকের কবিরা অনেক মুক্ত বাতায়নে নতুন ধরণের কবিতা লিখেছিলেন যেখানে মানবিক মূল্যবোধের একটা জায়গা আছে। ফলে সমাজচেতনার অভিব্যক্তি, সাম্প্রতিকতা, জাতিভেদ, নারী-নির্যাতন – এই বিষয়গুলি যা রাজনৈতিক দলীয়তামুক্ত সমাজভাবনা তা কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ভাবনামুক্ত এই আট দশকের কবিতায় কাব্যপ্রকরণ এবং ছন্দও নতুন। যেমন – 'মা' কবিতাটি আদ্যোপান্ত একটি গদ্যকবিতা যেখানে মা'কে নিয়ে তাঁর ভাবাবেগ নেই, আছে মাকে খুঁজে রাখা, জমিয়ে রাখা। এই কবিতার শেষ লাইনে আছে – "নক্ষত্রের নাম দিলাম ধ্রুবপদ কিম্বা

আমার মা।" ব্যক্তিগত অনুভূতির অন্যরকম অভিব্যক্তি। 'স্থিরতা' কবিতায় দেখি – 'অ্যাতো' এই শব্দটির বহির্প্রকরণের পরিবর্তনটি নতুন। কবিতাটি পড়লেই বোঝা যায় তিনি একটি নতুন বিষয়, বিষয়ান্তর, নতুন শব্দ নির্মাণ করতে চান যা ব্যক্তিগত ও সমাজানুভূতির থেকে আলাদা নয়। বিবাহযাত্রা ও যৌনযাত্রায় একটি সাঁওতাল বউয়ের কথাও এসেছে। "সাঁওতাল বউ, তোমাকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে পৃথিবী।"[২১] অথবা "আমার সাঁওতাল বউ/ কালই যাব জাহের থানে। ছড়িয়ে আসব পলাশ মহুয়ার ফুল/ বউ বলবে একটা টুকটুকে পৃথিবী, রঙিন পৃথিবী দাও, হে ঠাকুর।"[২২] কবিতায় প্রেমের সেই চিরন্তন অনুভূতিও আছে। এতে অলোক বিশ্বাসের কবিতার নতুনত্বটুকু ক্ষুন্ন হয়নি। 'প্রকরণ হবে পৃথক'[২৩] চল্লিশের, পঞ্চাশের কবিরা কবিতার প্রকরণ তৈরি করে দিক এটা তিনি কখনোই চাইতেন না। কবিতার ভাষা, কবিতার কালখন্ড যখন তার সমকাল পেরিয়ে যাবে তখনই সে 'ট্রানসেনডেণ্টাল'। কবির কথায় – "২০৫০ বা ৩০০০ সালেও লোকে আমার কবিতা পড়বে, কারণ ও প্রকৃতির বিভিন্ন রকম আচরণের প্রকাশ ঘটেছে আমার কবিতায়। যাঁরা সমকাল ছাড়িয়ে লিখছেন তাঁদের সকলের লেখাই ভবিষ্যতের পাঠক পড়বে। প্রাতিষ্ঠানিকতার কারণে নয়, ভালোলাগার কারণেই পড়বে।"[২৪] সাম্প্রতিক ও ভবিষ্যতের কথাই বলতে চান কবি। অপরত্বের ভাবনা সম্পর্কে উনি যা বলেছেন তা কিন্তু অনেকগুলি অপর ভাবনা। অপরত্বের ভাবনায় ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় একটি গতি আছে গতিটি এমন যেখানে সে গঠনে ও ভাষায় বৈচিত্র্যময়। যেন গতিমুখ পরিবর্তনকারী মধ্যযুগীয় কাব্যের গতিধারায় একটি থীম নিয়ে দলে দলে কবিরা লিখে গেছেন। জীবনানন্দ, নজরুল, বুদ্ধদেব, অরুণ মিত্র, শামসুর, শক্তি, সুনীল, শঙ্খ, মলয়, প্রভাত চৌধুরী – এ ভাষায় কেউ লেখেননি। পরে এদের ভাষাতেও কেউ লিখবে না, অন্যভাষায় লেখা হবে। এর জন্য চাই অপরত্ব বা বিকেন্দ্রীকরণ। এই বিকেন্দ্রীকরণে জীবনানন্দের 'উটের গ্রীবার নিস্তব্ধতা'কেই খুঁজে পাব। বাউলযাত্রা কবিতায় যেমন কবি বলেছেন "আমার একতারা এঁদো জলাভূমি আর মরুস্থান ছাড়িয়ে চলে গেছে/ কিউবায়, ভিয়েতনামে, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে। আমার একতারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রতিবাদী/ নামিবিয়া বাউল হয়ে গেছে"[২৫] অপরত্বের ভাবনা পার্থিব সময়ের সঙ্গে মেলে না, একটি নতুন, অপর ভাবনাজাত, যা পরিবর্তনশীল।

উল্লেখপঞ্জী

১। প্রবন্ধ সংগ্রহ, অনন্ত দাস, একুশ শতক, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা- ৪৭

২। আধুনিক কবিতার ইতিহাস, সম্পা: আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১১, পৃষ্ঠা- ২৪৩
৩। কবিতা সমগ্র ১, নীল আয়না, অলোক বিশ্বাস, iSociety, পশ্চিম মেদিনীপুর, জুন ২০২২, পৃষ্ঠা- ২৯
৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১
৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১
৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২
৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭
৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ২২
৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪
১০। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪
১১। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬
১২। কৌরব, সংখ্যা- ৫৮, সম্পা: কমল চক্রবর্তী, জামসেদপুর, পৃষ্ঠা- ১০১
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০০
১৪। কবিতা সমগ্র ১, মাকড়সার জাল, অলোক বিশ্বাস, iSociety, পশ্চিম মেদিনীপুর, জুন ২০২২, পৃষ্ঠা- ৩৬
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬
১৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬
১৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৬
১৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৫
২০। পঞ্চাশৎ-পরিক্রমা রবীন্দ্রপ্রয়ানোত্তর বাংলা সাহিত্য, কবিতা ২, সুমিতা চক্রবর্তী, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, শ্রাবন ১৪০০, পৃষ্ঠা- ৪৫
২১। কবিতা সমগ্র ১, মাকড়সার জাল, অলোক বিশ্বাস, iSociety, পশ্চিম মেদিনীপুর, জুন ২০২২, পৃষ্ঠা- ৫৮
২২। তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৯

২৩। কবিতা সমগ্র ১, আমার কবিতার নেপথ্যে, অলোক বিশ্বাস, iSociety, পশ্চিম মেদিনীপুর, জুন ২০২২, পৃষ্ঠা- ৫১০

২৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ৫১০

২৫। কবিতা সমগ্র ১, মাকড়সার জাল, অলোক বিশ্বাস, iSociety, পশ্চিম মেদিনীপুর, জুন ২০২২, পৃষ্ঠা- ৬৪

গ্রন্থপঞ্জী

১। প্রবন্ধ সংগ্রহ, অনন্ত দাস, একুশ শতক, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২১

২। আধুনিক কবিতার ইতিহাস, সম্পা: আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১১

৩। কবিতা সমগ্র ১, অলোক বিশ্বাস, iSociety, পশ্চিম মেদিনীপুর, জুন ২০২২

৪। পঞ্চাশৎ-পরিক্রমা রবীন্দ্রপ্রয়ানোত্তর বাংলা সাহিত্য, কবিতা ২, সুমিতা চক্রবর্তী, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, শ্রাবন ১৪০০

৫। কৌরব, সংখ্যা- ৫৮, সম্পা: কমল চক্রবর্তী, জামসেদপুর

ঋদ্ধি পান, গবেষক
Email: riddhipan2@gmil.com
Phone no: 9163560166